উপসংহার

আমার গবেষণা সন্দর্ভের বিস্তারিত পাঁচটি অধ্যায়কে আমি গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করেছি এবং শিল্পকৃতির ভেতরে প্রবেশ করে বের করে আনতে চেয়েছি বিষয়ের নির্যাসকে। বুদ্ধদেব বসুর গল্পগুলো পড়ে ও সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে আমি যে সিদ্ধান্তে পৌছেছি তা হলো— বুদ্ধদেবের গল্পভুবন, মূলতঃ তাঁর ব্যক্তিচেতনারই মৌলিক প্রতিভাস। তাঁর কথাসাহিত্যে যে সব নায়কের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাদের সকলের অবয়বেই বিম্বিত হয় ব্যক্তি বুদ্ধদেবের ছবি, তাদের কণ্ঠে শোনা যায় বুদ্ধদেবের আত্ম-অনুভূতির সংগ্রাম। বাংলা কথাসাহিত্য : প্রকরণ ও প্রবণতা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যে যে ব্যক্তিচেতনার উদ্ভাসন তা অনেক পরিমাণে লেখকের আত্মচেতনারই নামান্তর।' সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— 'বুদ্ধদেবের অধিকাংশ রচনা আত্মস্মৃতিমূলক।...সুতরাং বুদ্ধদেববাবুর রচনায় লোকের ভিড় নাই, মানুষের বিবিধ বৈচিত্র্যও নাই। আছে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই ধরনের নরনারী যাহারা কোন না কোন সময়ে লেখকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিল অথবা তাঁহারা কল্পনায় উদিত হইয়াছিল। আর প্রায় সব গল্পের নায়ক লেখক নিজেই।'

সুতরাং বুদ্ধদেব বসুর গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ব্যক্তি-চেতনা। ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির হৃদয়ের গূঢ় গভীর পিপাসা ও আর্তি নানা কাহিনি ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। গ্রাম-বাংলার বিস্তৃত জীবন পরিবেশ, ক্ষেতে-খামারে, কলকারখানায় শ্রমজীবী

মানুষ কিংবা সাধারণ সংগ্রামী দারিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি বুদ্ধদেবের। তিনি কলকাতার নাগরিক জীবনের রূপকার। অবশ্য সেই নাগরিক জীবনও জীবন সংগ্রামের উত্তরঙ্গ স্রোতের আঘাতে সংঘাতে বিক্ষুব্ধ জটিল বা কুলপ্লাবী নয়। সেই নাগরিক জীবনপট পরিশীলিত নায়ক-নায়িকার ব্যক্তি হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভব চেতনার আলোছায়ায় কারুকার্যমণ্ডিত। কথাসাহিত্যে কলকাতার নগরজীবনকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন 'কল্লোলের বহুশিল্পী। সমাজ সত্তার অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে গিয়ে, যে লেখকদের জীবন-ভাবনায় ব্যক্তির সমস্যা অন্তর্দ্বন্দ্ব সংশয় ও স্বপ্নকামনা প্রবল হয়ে উঠেছে, তারাও বুদ্ধদেবের মত এই নগর জীবন থেকেই নায়ক-নায়িকার সন্ধান করেছেন। বুদ্ধদেবের প্রায় সব গল্পেরই নায়ক হয় কবি-শিল্পী, না হলে সাহিত্যের কৃতী ছাত্র কিংবা কবিতা-প্রেমিক অধ্যাপক। বলা বাহুল্য, তারা সকলেই হয় গোড়া থেকেই কলকাতার মানুষ, না হলে মফঃস্বল শহর থেকে কলকাতায় এসে বসবাস করছে। বুদ্ধদেবের নানা গল্প-উপন্যাস ছড়ানো এই যে অসংখ্য নায়ক চরিত্র এদের মধ্যে বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্য তেমন চোখে পড়ে না। বস্তুত তাঁর সব নায়ক চরিত্রই একটি মাত্র মুখের ছাঁচে গড়ে তোলা। সে মুখ স্বয়ং লেখকের। তাঁর রচনায় যে সব নায়ক কথা বলছে, তাদের প্রায় সকলের কথার মধ্য দিয়ে একজনের কণ্ঠস্বরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে কণ্ঠস্বর বলাবাহুল্য, স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর। বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্যে যাকে ব্যক্তিচেতনা বলা হয় আসলে তা অনেক পরিমাণেই লেখকের আত্মচেতনারই নামান্তর।

বুদ্ধদেব বসু জীবনের একটা বিশেষ পর্যায়ে লেখালেখিকেই পেশা

হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনও জীবিকার প্রয়োজনেই তাঁকে কথা সাহিত্যের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ফলে তাঁর গল্পের কাহিনি বিন্যাসে বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু পাঠকের কাছ থেকে তিনি কখনোই প্রত্যাখ্যাত হননি, কারণ তিনি যা বলেন তাতে পাঠকের সম্মতি না থাকলেও যেভাবে বলেন তার সম্মোহনকে স্বাগত জানাতে হয়। তাঁর এই সম্মোহনের মূলমন্ত্র তাঁর কবি প্রতিভার মর্মে নিহিত। গল্প বলার এক অসাধারণ ধরন তিনি রপ্ত করেছিলেন। পাঠকের কল্পনা প্রতিভাকে তিনি এমনভাবে জাগ্রত করেন যেন লেখকের মতোই তাঁর গল্পের পাঠক ও সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনার গায়ে তিনি এমন এক কাব্যিক ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেন যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই ঘটনার অনুরণন পাঠক চৈতন্যে অনিঃশেষ আলোড়ন তোলে, জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভাষায় বলা যেতে পারে : 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।'

বুদ্ধদেব বসুর গল্পগুলো পাঠ করে মনে এক বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তিনি তাঁর শব্দে ও ভাষায় অনায়াসেই সঞ্চার করে দেন আপন সত্তার সৌরভ। কবি বুদ্ধদেব কবিতার শক্তিতে ভর দিয়ে উপন্যাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, ছোট গল্পের ছোট্ট পরিসরে নিজের মনোজগতের কথা ও সমাজের বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব বসুর গল্পে যে বৈষয়িক পরিমণ্ডল, গল্পের পাত্র-পাত্রীদের মনোজগতের যে ব্যাকরণ, তাদের সম্পর্ক কিংবা সংঘর্ষের যে গতিবিধি তা এক কথায় অপরিহার্য। মনোজগতের দ্বন্দ্বজটিল বাস্তবতাকেই তিনি বার বার পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। মিলনের গান তাঁর কণ্ঠে আমরা শুনেছি, কিন্তু বিরহ, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতার শৈল্পিক রূপায়ণেই তাঁর কৃতিত্ব চোখে পড়ার মতো।

‘কবিতার শত্রু ও মিত্র’ গ্রন্থে বুদ্ধদেব লিখেছেন— ‘আমরা পরস্পরকে যতই না ভালোবাসি, আমাদের শরীর দুটো তো আলাদা, শরীরের মধ্যে দুই জীবনও আলাদা। অত্যন্ত আপনজনকেও কোনো আসল কথা বলা যায় না, পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ একলা।’ এই একলা মানুষেরই মুহূর্মুহু উপস্থিতিতে মুখর কিংবা মৃয়মাণ তাঁর কথাসাহিত্য। তাঁর অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা এই নিঃসঙ্গতা নামক ভয়ানক ব্যধিতে আক্রান্ত। ফলে তাদের সংলাপ কিংবা মনের ভাব উন্মোচনের যে ভাষা তিনি নির্মাণ করেছেন, সেখানে কেবল কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রণই নয়, আলো ও অন্ধকারের পরস্পর প্রোথিত রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর জীবনে শূন্যতা কিংবা নিঃসঙ্গত কেবল এক বিশেষ ধরনের অনুভব নয়, শূন্যতাকে তিনি দেবতার মতো করেই পুজো করেছেন। সেই পূজার যে ফুল, তা কল্পনার মতোই সুন্দর, পবিত্র ও প্রাণবন্ত।

আনন্দ রায় সম্পাদিত বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ গ্রন্থের ‘শীতের কাছে প্রার্থনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে সন্তোষকুমার লিখেছেন— ‘ভূলোক থেকে বুদ্ধদেব উড্ডীন হয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, অথচ দ্যুলোকে উত্তীর্ণ হননি, সেই কারণেই হয়তো দ্যুলোক ভূলোক এই দুই ভূবনের মাঝখানে দুলছেন, ঝাপটাচ্ছেন অস্থির অনিশ্চিত, অশান্ত ডানা। সন্দেহ হয়, একটি স্থিতি তিনি কোথাও পান না আমরা কে-ই বা পাই। আজও রমনা তাঁকে পিছন থেকে টানে, পাশ্চাত্য সামনে থেকে দেয় হাতছানি, মাঝখানে আছে কলকাতা, একদা তাঁর চোখ ধাঁধাঁনো কলকাতা।’

কলকাতার যে পরিমণ্ডলে কবিও কথাশিল্পী বুদ্ধদেব সক্রিয় ছিলেন, তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রিরাও সেই জগতেরই অগ্রসর মানুষ। বুদ্ধদেবেরই মতো তাঁর

পাত্রপাত্রিরাও রবীন্দ্র সাহিত্যের ভক্ত পাঠক, শিল্প সাহিত্যের স্বদেশীও বৈশ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তারা সচেতন। তাঁর প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা ধার করেই যেন তাঁর গল্পের তথা কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা অনর্গল স্মৃতিচারণ করতে থাকে। তাঁর পাত্রপাত্রিরা তাঁরই মতো নাগরিক জীবনের নানা জটিলতায় জীর্ণ। তাঁর কথাসাহিত্যের মানুষজনেরা যৌন-জীবনের অস্থির-অশোভন কিংবা অসঙ্গত আদান-প্রদানে অকুণ্ঠ। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য : 'বিবাহোত্তর প্রেম এবং সে প্রেমে যৌনতা তথা দেহচেতনার উপস্থিতির কারণে বুদ্ধদেবের নায়ক-নায়িকারা নিপতিত হয়েছে জটিল জীবনাবর্তে।' বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হলো উতলা', 'তুলসী গন্ধ', 'জয়জয়ন্তী', 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা', 'একটি কি দুটি পাখী', 'রাত ভরে বৃষ্টি', 'তিথিতোর', 'গোলাপ কেন কালো' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসে আমরা যৌন চেতনাশ্রয়ী মানুষের অসংলগ্ন কর্মকাণ্ডের বিস্তর প্রমাণ খুঁজে পাই। এই বৈষয়িক পরিমণ্ডল তাঁর কথাসাত্যের ভাষা-শরীরকেও প্রভাবিত করেছে।

গল্পে নায়ক-নায়িকার চিন্তাধারা বা মানসিকতাকে নয়, বুদ্ধদেব সব সময় গুরুত্ব দিয়েছেন চরিত্রের প্রকাশ-অসাধ্য অনভূতিকে। সাহিত্যের শব্দ বিন্যাসের যে জাদু, তা প্রয়োগ করে তিনি নায়ক-নায়িকার অনুভূতিতে প্রকাশের ভাষারূপ দিয়েছেন। আর এই কৌশলের জন্য তাকে ধার করতে হয়েছে ফরাসি কবি বোদলেয়ার-মালামে এবং পল ভ্যালেরির প্রকাশশৈলী। বুদ্ধদেবের পাত্রপাত্রিরা তাদের কথোপকথনে প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। কলকাতার কথ্যভাষার বিশিষ্ট রূপটিই তাঁর প্রধানতম অবলম্বন। ক্রিয়াপদ ব্যবহারে তিনি অমিতব্যয়ী শুধু নন, বরং বলা চলে ভয়ানকভাবে সীমিত এবং তাঁর এই প্রয়াস গদ্যের গতিশীলতার

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর, অনেক অপ্রচলিত শব্দকে তিন অবলীলায় বাক্যের ভেতর চালিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরই চেতনার রঙে উজ্জ্বল তাঁর পাত্রপাত্রীদের মনোজগত, এমনকি বুদ্ধদেবের ভাষাই তাঁর কথাসাহিত্যের মানুষজনের মুখের ও মনের ভাষা।

কবি হিসেবে তিরিশোত্তর কাব্যধারায় অনন্য নাম বুদ্ধদেব বসু। কবিতা পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন কালে কবি ও কবিতার প্রতি বিরাট দায় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন এই সাহিত্যিক। কথাসাহিত্য কিংবা প্রবন্ধে তাঁর সৃজনশীলতা পাঠক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। নতুন কবিতা সৃষ্টিতে কিংবা কবিদের প্রতিভা ও গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়নেও বিরাট ভূমকিা পালন করেছেন তিনি। বুদ্ধদেবের মতো বহুমুখী প্রতিভার মানুষ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি আসেনি। কেবল লিখেই নয়, লেখাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে এবং বিশেষত অনুদ্ঘাটিত বিষয়াদি অনুসন্ধান করে জনসমক্ষে প্রকাশ করার ব্যাপারে তার নিষ্ঠা আজও ঈর্ষণীয় এবং অবশ্য অনুকরণীয়। বুদ্ধদেব বসু অনুবাদের মাধ্যমে ফরাসি, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখা অতি সামান্য বিষয়কে অসামান্য করে তোলে। কে বলবে যে, ১৯২৫-৩০-এর গ্রাম্য পুরানা পল্টন একটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও রহস্যময় স্থান ছিল, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যে পুরানা পল্টন নিজের সামান্যতা হারিয়ে প্রায় অলৌকিক এক লোকালয়ে পরিণত হয়েছে। কলকাতার অলিগলি ও রাস্তাঘাট ও তাঁর লেখার জাদুস্পর্শে তাদের দৈনিকতা হারিয়ে অনন্য হয়ে ওঠে। কবির শক্তি সম্পর্কে কোলরিজের যে সর্বজনগ্রাহ্য উক্তি সেটি বুদ্ধদেব বসুর লেখা সম্পর্কে

খুবই প্রযোজ্য। কোলরিজের মতে— কবি রাখেন সেই ক্ষমতা যার সাহায্যে তিনি পাঠককে রচনা পাঠকালে ব্যক্তিগত অবিশ্বাসের কার্যকারিতাকে স্বেচ্ছায় স্থগিত করে দিয়ে কবি যা বলছেন সেটাকেই সত্য বলে ধরে নিতে বাধ্য করেন। বুদ্ধদেবও জানেন প্রায় অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে। কোলরিজের প্রসঙ্গ এলে রোমান্টিক কবিদের কথা মনে পড়ে। রোমান্টিক কবিদের প্রধান গুণ হচ্ছে সৃষ্টিশীল কল্পনা। বুদ্ধদেব বসু ও একজন রোমান্টিক কবি, তাঁর কল্পনাশক্তি পরিচিতকে অজানা করে তোলে, যদিও অজানাকে যেসব সময়ে পরিচিত করে দেয় এমন নয়। রোমান্টিকরা সাধারণত আত্মমুখী হন, সে গুণটিও বুদ্ধদেবের রচনার সর্বত্র পাওয়া যাবে।

বুদ্ধদেবের কথাসাহিত্য নারী প্রধান নয়, পুরুষ প্রধান বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই অধিক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নারীদের দৈহিক সৌন্দর্য, তাদের চিন্তা চেতনা তথা তাদের ব্যক্তিত্ববোধ বুদ্ধদেবের গল্পে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর গল্পের নায়কেরা কর্তৃত্বপরায়ণ এবং যতটা না সংবেদনশীল সে তুলনায় অনেক বেশি স্পর্শকাতর। তারা মনে করে তারাই কেন্দ্রীয়, অন্যরা বিশেষ করে মেয়েরা হচ্ছে পরিধির। মেয়েরা অধিকাংশই সুন্দরী, কিন্তু সেটা মেয়েদের নিজেদের আনন্দের জন্য নয়, নায়কদেরকে চরিতার্থতা দানের প্রয়োজনে।

বুদ্ধদেব বসুর রচনায় নিম্ন মধ্যবিত্ত উপাদানগুলো আমরা সহজেই দেখতে পাই। সমস্ত আধুনিকতা, নাগরিকতা এবং ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুর ভুবনটিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত উপাদানের

কোন অভাব নেই। নিম্ন মধ্যবিত্তের অহমিকা, লেখাপড়া নিয়ে বড়াই, বিচ্ছিন্নতা, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করে তোলা, খাদ্যে উৎসাহ এবং সম্ভব অসম্ভব নানা ধরনের কল্পনা বিলাস, ইউরোপ আমেরিকার প্রতি মোহগ্রস্থতা এরকম অনেক কিছুই তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর গল্প-উপন্যাস শিরোনাম যে কোন নিম্ন মধ্যবিত্তের পছন্দ হওয়ার কথা। যেমন— 'ঘরেতে ভ্রমর এলো', 'প্রেমের বিচিত্র গতি', 'ভদ্রতা কাকে বলে', 'হাওয়া বদল', অসামান্য মেয়ে', 'বাসবঘর', 'তুমি কি সুন্দর', 'রাধারানীর নিজের বাড়ি', 'রান্না থেকে কান্না' ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পে বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বিশেষ কোন ভাবনা বা কোনো তীব্র অনুভূতি বা কোনো জটিল প্রণয়াবেগ অথবা সংরাগের কাব্যপম আত্মকথন, মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের আশা-নিরাশার খণ্ডদৃশ্য, অনুরাগের বিভিন্ন অভিব্যক্তি চিত্ত বৈকল্যের নানা প্রকাশ, ছোটোখাটো মানবিক দুর্বলতার হরেক নমুনা, কোথাও কোনো নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবীর জীবনের এক ঝলক ইত্যাদি।